রাখির উত্স সন্ধানে

জহর সরকার

বোনেরা ভাইদের হাতে রাখি পরিয়ে দেওয়ার জনপ্রিয় উত্সবটি দেখে দুটো কথা মনে হয়। এক, আমাদের ধর্ম ও ইতিহাসের কাহিনিতে ভাইয়েরাই তো চিরকাল বোনদের রক্ষা করে এসেছে, রক্ষাবন্ধন নামক অনুষ্ঠানে ব্যাপারটা তবে হঠাত্ উল্টে গেল কেন? দুই, পুরনো কথা ও কাহিনিতে ভাইয়ের হাতে রাখি পরিয়েছে পাতানো বোনেরা, নিজের ভাইবোনদের মধ্যে এই প্রথা তো আগে ছিল না, এটাই বা এল কোথা থেকে? বিশেষ করে, যখন ভাইবোনকে নিয়ে একটি অনেক প্রাচীন ও বহুলপ্রচলিত অনুষ্ঠান আছে, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা।

রাখি সংক্রান্ত সবচেয়ে প্রাচীন কাহিনিটি পাওয়া যায় ভবিষ্যপুরাণ-এ। যে কয়েক জন দৈত্যের উপদ্রবে দেবতারা নাজেহাল হতেন, বলি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। শেষ পর্যন্ত দেবগুরু বৃহস্পতির কাছে উপদেশ নিয়ে শ্রাবণ পূর্ণিমার দিনে দেবরাজ ইন্দ্র বলির সঙ্গে লড়াই করতে গেলেন। শচী তাঁর হাতে বেঁধে দিলেন বিশেষ মন্ত্রঃপূত রক্ষাবন্ধনী। সেটাই রাখির আদি উত্স। তবে এ কাহিনিতে ভাইবোনের কোনও ব্যাপার নেই। সেটা এসেছে অন্য সূত্রে। ভাগবতপুরাণ এবং বিষ্ণুপুরাণে দেখি, দৈত্যরাজ বলি বিষ্ণুরও শত্রু। বিষ্ণু তাঁকে হারালেও পুরোপুরি বাগে আনতে পারলেন না, কারণ বলি তাঁকে স্বগৃহ থেকে উত্খাত করে নিজের প্রাসাদে থাকতে বাধ্য করলেন। বিষ্ণুর এই উদ্বাস্তু হওয়াটা মা লক্ষ্মী মেনে নিতে পারলেন না, তিনি একটি রাখি নিয়ে বলিরাজের কাছে গেলেন এবং তাঁকে ‘ভাই’ বলে ডেকে সেটি তাঁর হাতে বেশ করে পরিয়ে দিলেন। দৈত্যরাজ বিষ্ণুকে বাড়িতে লক্ষ্মীর কাছে ফিরতে দিলেন। এখানে কোনও সহোদর ভাইবোনের ব্যাপার নেই। মহাভারতেও দেখি, কৃষ্ণ জখম হলে দ্রৌপদী নিজের শাড়ির পাড় ছিঁড়ে ক্ষতস্থান বেঁধে দেন এবং কৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দেন, ‘বোন’কে প্রতিটি সুতোর প্রতিদান দেবেন তিনি। আবার অভিমন্যু তাঁর অন্তিম যুদ্ধে রওনা হওয়ার আগে ঠাকুমা কুন্তী তাঁর হাতে রাখি বেঁধে দিয়েছিলেন, এ গল্পও মহাভারতে আছে।

আর একটা কাহিনি পাওয়া যায়। আলেকজান্ডারের সঙ্গে পুরুর লড়াই শুরু হওয়ার আগে তাঁর স্ত্রী গ্রিক বীরের কাছে গিয়ে তাঁর হাতে রাখি পরিয়ে অনুরোধ জানান, তিনি যেন পুরুর কোনও ক্ষতি না করেন। এ গল্প বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু এটি খুব প্রচলিত। হয়তো রাখিকে একটা ঐতিহাসিক ভিত দেওয়ার জন্যেই এই কাহিনির প্রচলন হয়। আর একটা ‘ঐতিহাসিক’ গল্পও আছে, সেটা একেবারে সাল-তারিখ সুদ্ধ। ১৫৩৫ সালে গুজরাতের সুলতান যখন চিতোর আক্রমণ করতে আসেন, তখন সেখানকার বিধবা রানি কর্ণাবতী মুঘল বাদশা হুমায়ুনের কাছে সাহায্যের অনুরোধ জানান। হুমায়ুন ছিলেন তাঁর রাখি-ভাই। হুমায়ুন অবশ্য সময়মত সৈন্য পাঠাতে পারেননি, রানি যুদ্ধে পরাজিত হন। এই কাহিনিরও ঐতিহাসিক প্রমাণ বিশেষ নেই, তবে সপ্তদশ শতকের রাজপুতানার গল্পগাথায় এটি খুব পরিচিত। এই কাহিনি থেকে একটা ব্যাপার বোঝা যায়: হিন্দু রাজারা তত দিনে ‘ভাল মুসলমান’ আর ‘খারাপ মুসলমান’-এর তফাত করতে শিখেছিলেন। এবং, ‘ফ্রন্ট’ আর ‘জোট’-এর যুগ আসার অনেক আগেই অপ্রত্যাশিত বোঝাপড়ার জন্য রাখির ব্যবহার রীতিমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পশ্চিম ভারতে শ্রাবণের পূর্ণিমা তিথি উদ্‌যাপিত হয় ‘নারিয়েলি পূর্ণিমা’ হিসেবে। বরুণদেবকে সন্তুষ্ট করতে এই দিন মানুষ জলে নারকেল বিসর্জন দেন, একাধিক নদীর সঙ্গমস্থলে কিংবা সাগরেও ধুমধাম করে এই অনুষ্ঠান হয়। উত্তর ভারতে আবার এটির নাম ‘কাজরি পূর্ণিমা’। কৃষকরা এই দিন ধরিত্রীর আশীর্বাদ নিয়ে গম ও যবের বীজ বপন করেন। এক শতাব্দী আগে উইলিয়ম ক্রুক লিখেছিলেন, মেয়েরা এই দিন সারের পাত্রে যবের বীজ রাখেন, তার পর যখন হলদেটে সবুজ রঙের অঙ্কুর নির্গত হয়, তখন সেটি পরিষ্কার করে তাঁরা পুরুষদের

মধ্যে বিতরণ করেন। মেয়েদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পিছনে প্রাচীন সমাজে মেয়েদের সঙ্গে উর্বরতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ধারণাটি কাজ করে। আর, মনে রাখা ভাল, বহু কাল ধরে সারা বছর মানুষের বিভিন্ন কাজের সময়টাকে নির্দিষ্ট করার কাজে চাঁদ একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেছে, সেই কারণেই বিভিন্ন পূর্ণিমার গুরুত্ব ।

পাহাড়ে আবার অন্য কাহিনি। কুমায়ুনে এই দিনটি পালন করা হয় ‘জান-পুণ্য’ হিসেবে, জান মানে পবিত্র সূত্র । অনেক জায়গায় মেলা হয়, তাদের মধ্যে দেবীধুরা বগওয়াল-এর মেলাটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। নেপালেও উত্সবের এই একই নাম, সেখানে প্রিয়জনের হাতে সুতোটি বেঁধে দেওয়া হয়। সেখানে এই অনুষ্ঠানে একটি বিশেষ খাবার খুব জনপ্রিয়। সাত রকমের শস্য দিয়ে তৈরি এই খিচুড়ির নাম ‘কোয়াতি’। স্পষ্টতই বীজ বপনের মরসুম বলেই এই খাবারটির প্রচলন। নেপালের মানুষ রাখি উত্সব উপলক্ষে পশুপতিনাথ, গোসাঁইকুণ্ডা, কুম্ভেশ্বর এবং অন্য বিভিন্ন মন্দিরে শিবের আরাধনা করেন। জম্মুতে রক্ষাবন্ধনের দিনে ঘুড়ি ওড়ানোর প্রচলন আছে, আমাদের যেমন আরও পক্ষকাল পরে, বিশ্বকর্মা পুজোয়।

দ্রাবিড় সভ্যতায় শ্রাবণ পূর্ণিমার এই তিথিকে বিশেষ ধর্মীয় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণী ব্রাহ্মণরা এই দিন তাঁদের পবিত্র উপবীতটি পালটে নতুন উপবীত ধারণ করেন। রক্ষাবন্ধন পালিত হয় ‘বিষতাড়ক’ হিসেবে। লক্ষণীয়, এর ক’দিন আগেই সর্পদেবীকে সন্তুষ্ট করতে পালিত হয় নাগপঞ্চমী। বাংলার মনসা দেশের নানা অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পূজিত হন। বিশেষত, বোনেরা এই দেবীর কাছে তাঁদের ভাইদের রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করেন। শ্রাবণ হল ভরা বর্ষার মাস, এই সময়েই সাপের ছোবল থেকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা সবচেয়ে বেশি দরকার, তাই না?

কিন্তু এ পর্যন্ত রক্ষাবন্ধনের গল্পে সহোদর ভাইদের তো কোনও স্থান নেই। তাঁরা প্রবেশ করলেন কী ভাবে? কালক্রমে স্ত্রী, বিধবা এবং পাতানো বোনদের সরিয়ে সহোদরা বোনেরা কেন ভাইদের হাতে রাখি পরাতে এগিয়ে এলেন? নিশ্চিত করে বলা কঠিন। ক্রমশ শহরের প্রসার ঘটছে, পরিবার ভাঙছে, ভাইবোনেরা একে অন্যের থেকে দূরে থাকছে, ফলে নানা উপলক্ষে তাদের একসঙ্গে আসার নতুন সুযোগ দেওয়ার দরকার হচ্ছে ।

রবীন্দ্রনাথের কথা না বলে লেখা শেষ করা চলে না। ১৯০৫ সালে কার্জনের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর এক সুচিন্তিত এবং কল্পনাঋদ্ধ রীতি হিসেবে তিনি রাখিবন্ধন উত্সব পালন করেছিলেন। আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক হিসেবে রাখি মহোত্সব প্রবর্তন করে তিনি এই অনুষ্ঠানকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যান।

প্রসার ভারতীর কর্ণধার। মতামত ব্যক্তিগত